মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী ও বিপ্লবী

হায়দার আকবর খান রনো

কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ পূর্ণ হলো এই বছরের ১৯ মে। তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তার জীবনাবসান ঘটে ১৯৫৬ সালে। তার প্রথম প্রকাশিত রচনা 'অতসী মামী' ছিল একটি ছোটগল্প, যা ছাপা হয়েছিল তার কুড়ি বছর বয়সে ১৯২৮ সালে। সে হিসাবে তার সাহিত্য জীবন ছিল মাত্র ২৮ বছর। অবশ্য এর আগেও তিনি লিখেছেন, তবে সেগুলো কবিতা। ষোল বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একশটির মতো কবিতা লিখেছিলেন, যা তার মৃত্যুর পর একটি খাতার মধ্যে হাতে লেখা আকারে পাওয়া যায়। তিনি পরবর্তী জীবনেও কবিতা লিখেছেন, তবে কোনও কবিতা প্রকাশ করেননি। ১৯৩৪ সালে ছাপা হয় তার প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'। সেখানে তিনটি পর্ব আছে। প্রতি পর্বের শুরুতে একটি করে কবিতা আছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম রচনা 'অতসী মামী' গল্পটি ছাপার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ব্যবহার করেছিলেন। পরের সবকটি লেখায় এই নামই রয়ে গেছে। তিনি এখন এই নামেই পরিচিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বমোট ৩৯টি উপন্যাস ও ২শ ৫০টি ছোট গল্প লিখেছেন। এ ছাড়া তার কিছু প্রবন্ধ আছে। কবিতার কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। প্রধানত তিনি কথাশিল্পী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তার কোনও কোনও উপন্যাস বিশেষ করে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মা নদীর মাঝি' আমার বিবেচনায় নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য। কিন্তু বিশ্বের দরকার মানিকের রচনার মতো বাংলা সাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদই অপরিচিত রয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শক্তিশালী লেখকই নন, তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রগতির ধারার উদ্বোধন ঘটান। চল্লিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য পদ লাভ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী যুগের রচনাসমূহকে সাধারণত উত্তরকালের রচনা বলে চিহ্নিত করা হয়। এর আগে তার ওপর সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে তিনি ফ্রয়েডকে পরিত্যাগ করেন। ফ্রয়েড সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন '... ফ্রয়েডকে আমরা মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিরদিন স্মরণ করব, কিন্তু কেপলারের মতো ফ্রয়েডেরও পৌরাণিক সংস্কারে আচ্ছন্ন চিন্তাধারা আজ ঢেলে সাজানো দরকার...।' ইংরেজ মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্য সমালোচক ক্রিস্টোফার কডওয়েল (যিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন) থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ফ্রয়েড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'Just because Fraedism to not a science, it falls as a theraphy.' তার মানে বোঝা যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট কডওয়েলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বসাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, ডিকেন্স, জোলা তার পড়া ছিল। তখন মার্কসবাদের বই খুব বেশি পাওয়া যেত না। তবে যেটুকু পাওয়া গেছে তা তিনি পড়েছিলেন এবং বুঝেসুঝেই মার্কসবাদী হয়েছিলেন। মার্কসবাদের মূল কথাটি তার জানা ও বোঝা হয়েছিল। মার্কসবাদের নির্দেশিত পথে সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি নিজেকে সাহিত্য অঙ্গনে মার্কসবাদী সৈনিক হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তার নিজের কথা, '... মার্কসবাদই যখন মানবতার প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কী ছিল, বর্তমান কী হয়েছে এবং কীভাবে কোন ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে, তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে– এলোমেলো, উল্টাপাল্টা অনেক কিছুই তো ঘটবেই... ।'

কলেজ জীবনে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তার বেশিদূর হয়নি। তবু বিজ্ঞান তার ভালো লাগত, বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে তার দারুণ আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানমনস্কতা তার মধ্যে সবসময় লক্ষ্য করা গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবদ্দশায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার প্রথম জীবনের রচনা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মা নদীর মাঝি' খুবই বাণিজ্য সফল হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনা ছাড়া আর উপার্জনের জন্য অন্য কোন কাজ করেননি। বছরখানেক সামান্য প্রেসের ব্যবসার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তার ওপর তিনি কমিউনিস্ট হয়ে গেলে কোনও কোনও মহল তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতেও দেখতে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'পয়সাওয়ালা কাগজওয়ালা আমাকে একরকম বয়কট করেছে।' সব মিলিয়ে তিনি খুবই অর্থকষ্টের মধ্যে জীবন কাটান। তবু তিনি কখনই ভিন্নমতাদর্শের সঙ্গে আপস করেননি। সামান্যতম সুবিধাবাদ তাকে কখনই স্পর্শ করতে পারেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সৎ, আদর্শনিষ্ঠ, মহৎ সাহিত্যিক।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমরা যদি বাংলা উপন্যাসের ধারা ধরি (যদিও তার আগেও কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছিল), তাহলে দেখব ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের চরিত্রগুলো সবই ধনী। অন্তত দরিদ্র নয়, সেই সব উপন্যাসে অনেক মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকলেও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নাই, জীবন সংগ্রামের কোনও চিত্র নাই। শরৎচন্দ্র মহৎ শিল্পী। তার উপন্যাসে আছে অসামান্য অথচ সাধারণ নারীরা, আছে সমাজের গলিত চেহারা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। চরিত্রগুলো মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত। একমাত্র মহেশ গল্পের গফুর গরিব কৃষক, যে বাধ্য হচ্ছে শহরের শ্রমিক হতে। শরৎচন্দ্রের পর তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের উপন্যাসে জড়ো হয়েছে গরিব ও সমাজের নিচুতলার মানুষ। বিভূতিভূষণের লেখায় গরিব মানুষ এসেছে, এমনকি দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্রও আছে, দুমুঠো ভাতের জন্য নারীর সম্ভ্রম বিক্রির ঘটনাও আছে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম নেই। তারাশঙ্কর একেবারে নিচের তলার মানুষদের নিয়ে লিখেছেন। তাদের জীবনের হাসি-কান্না অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন শিক্ষিতজনের কাছে। তিনি বড়মাপের শিল্পী। তিনি

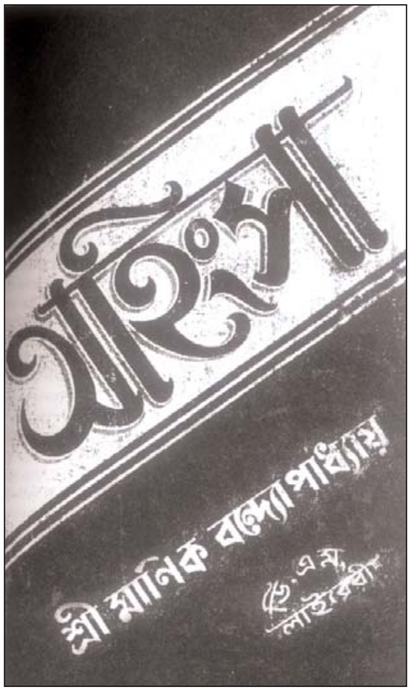

রাজনীতিও করেছেন। কিন্তু সে রাজনীতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি থেকে ভিন্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি মার্কসবাদী রাজনীতি করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাই সাহিত্যেও ফুটে উঠেছে শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র। তিনি শোষিত মানুষের বিজয়ের আশাবাদ শুনিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রগতির ধারার সূচনা লক্ষ্য করতে পারি। কবি নজরুল বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন, সাম্যের গানও শুনিয়েছেন। কবি নজরুলের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদের বন্ধুত্ব ছিল। তাই কবি নজরুল কমিউনিজমের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে কবি সুকান্ত বাংলা কবিতায় নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন। কবিতায় তিনি মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন। সুকান্তের কবিতায় শ্রেণী সংগ্রাম আরও মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। আর গদ্যে, উপন্যাসে সেই ধারার প্রবর্তন করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাই বলে কী সুকান্ত বা মানিকের শিল্পের উৎকর্ষ নষ্ট হয়েছিল? মোটেও না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের লেখা যেখানে কখনও কখনও ফ্রয়েডের

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন। তার রচনায় চমৎকার কাব্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'দিবারাত্রির কাব্য'। এ যেন আসলেই কাব্য। এই উপন্যাসের শেষ অংশে মন্দির প্রাঙ্গণে লেলিহান অগ্নিশিখার পাশে বিবসনা আনন্দের নৃত্যের যে বর্ণনা তা যেন মহাকাব্যের উচ্চশিখরকে স্পর্শ করে। মানিক সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় অনেক জায়গায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। এর মধ্যে কি স্ববিরোধিতা আছে?

প্রভাব দেখা যায় অথবা পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদী মানিকের রচনা সব কয়টি নান্দনিক দিক দিয়ে অতি উঁচুমানের। কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি ও রচনাশৈলী পাঠককে অনেক উঁচু চেতনার জায়গায় নিয়ে যায়। কোনও কোনও গল্পে বা উপন্যাসে যৌনতা আছে, যেমন প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি অথবা চতুষ্কোণ উপন্যাস। প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। যৌনতার বিষয় থাকলেও বলাই বাহুল্য তার মধ্যে অশ্লীলতা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথাই শোনা যাক।

'চাষাভূষা নিয়ে গল্প লিখবো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য... রসসৃষ্টি করবো একমাত্র ঐ দুটি ভুকা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে ...। সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গেছে। চাষী মজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর

সহজ সরল মানেই হলো পশুপাখীর প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই বিকারকেই তৃপ্তি দান।'

একইভাবে যে-সব রচনায় মার্কসের প্রভাব আছে, তাও সস্তা প্রচারধর্মী হয়নি। ১৯৪৬ সালে রশীদ আলী দিবসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে গণজাগরণ ঘটেছিল, তারই পটভূমিতে লেখা 'চিহ্ন' একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাস। মাত্র দুই ঘণ্টার সময়কে ধরে লেখা এই উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই উপন্যাসের নায়ক কেউ নয়, নায়ক জনতা। চরিত্রগুলোর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে। মানিকের বিভিন্ন উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলমান চরিত্র একইসঙ্গে প্রধান ভূমিকায় এসেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলো সাধারণত গরিব ও শ্রমজীবী। এমনকি তার কমিউনিস্ট হবার আগের যুগেও যেসব লেখা হয়েছে, যেমন পদ্মা নদীর মাঝি, তার চরিত্রগুলো গরিব মানুষ। সেখানেও গরিব শ্রমজীবীর প্রতি দরদ ও শোষক ধনীর প্রতি ঘৃণা ফুটে উঠেছে। পদ্মা নদীর মাঝি থেকে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করা যাক, যেখানে রয়েছে গরিব মৎস্যজীবীর গ্রামের বর্ণনা। 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। ... ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' ধর্ম সম্পর্কেও ছোট একটি বক্র মন্তব্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন। তার রচনায় চমৎকার কাব্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'দিবারাত্রির কাব্য'। এ যেন আসলেই কাব্য। এই উপন্যাসের শেষ অংশে মন্দির প্রাঙ্গণে লেলিহান অগ্নিশিখার পাশে বিবসনা আনন্দের নৃত্যের যে বর্ণনা তা যেন মহাকাব্যের উচ্চশিখরকে স্পর্শ করে। মানিক সাহিত্যে রোমান্টিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় অনেক জায়গায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। এর মধ্যে কি স্ববিরোধিতা আছে? না, নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্যিক বিশ্ব বিখ্যাত ম্যাক্সিম গোর্কির একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন যে, বালজাক, তুর্গনেভ, গোগল, লেসকভ অথবা চেখভের মতো ধ্রুপদী সাহিত্য রোমান্টিক না বাস্তববাদী ছিল, কারণ সব মহৎ শিল্পকর্মে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার মিশ্রণ থাকে।'

তিন

প্রথমেই বলেছি যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে নব প্রগতির ধারায় উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। তিনি গল্পে ও উপন্যাসে শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে এসেছেন এবং সাহিত্যকে শোষিত মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। এটাই তার সবচেয়ে বড় অবদান। শ্রেণী সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে তার যে সব উপন্যাস বা গল্প আছে, এই সংক্ষিপ্ত রচনায় সে সম্পর্কে আলোচনা তো দূরের কথা, সব কটির উল্লেখও সম্ভব হবে না। বিশেষ করে ছোট গল্পগুলোতে শ্রেণী সংগ্রাম খুবই জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ড্রইং রুমে বসে শ্রেণী সংগ্রামের কাল্পনিক ছবি আঁকেননি। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি তেভাগার অঞ্চলে গেছেন। কারখানায় মজুরের জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। হুগলি জেলার সিঙ্গার থানায় পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছিল কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের (১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি)। কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গেছেন। তারপর লিখেছেন, 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। শুধু সাহিত্যের মানের দিক দিয়েও অতি উঁচুমানের গল্প। এই সব গল্পে তিনি কেবল অত্যাচারের কথাই বলেননি, কেবল দুঃখ-বেদনার কথাই বলেননি, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের জয়ও ঘোষণা করেছেন। নির্ভীক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মানুষের সামনে সরকারের পেটোয়া বাহিনী কীভাবে অসহায় হয়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন, 'মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।' শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রতি আস্থাশীল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন কেবল লেখকই নন, তিনি এখানে মুক্তি সংগ্রামের নেতার ভূমিকাও পালন করেছেন।

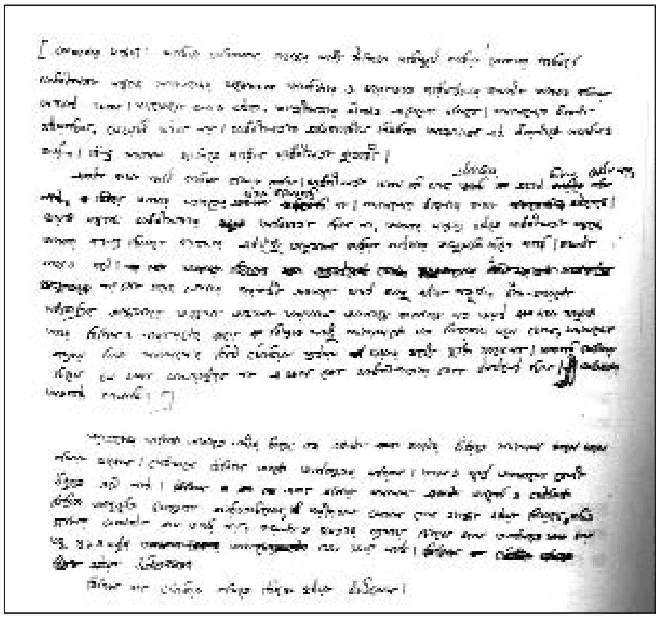

'অহিংসা' পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিজস্ব লেখার স্টাইল তৈরি করেছেন এবং যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ভাষার মধ্যে আছে তেজ, আছে শোষক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা, আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। কখনও কখনও তার ভাষা যেন চাবুকের মতো চমকায়, যে চাবুক গিয়ে পড়ছে শোষক শ্রেণীর গায়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লিখেছেন, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন। প্রতিটি লেখাই পাঠককে শোষকশ্রেণীর, বুর্জোয়া ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া সমাজকে যেভাবে তিনি উলঙ্গ করে তার কদর্য চেহারা তুলে ধরেছেন, তার রাজনৈতিক মূল্যও অনেক।

'Art for arts sake' এই মতবাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন না। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত 'গণ নাট্য সংঘের' প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এদের চোখ কটকট করে না। শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই।'

কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী হিসাবে তার কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। রুশ লেখক গোর্কির মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যে প্রলেতারিয়েতের প্রথম সার্থক লেখক।

সেফওয়ে